দৈনিক বাংলা
01 JUL 1992
তারিখ 28 JUN 1992
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৩
73

এই রণাঙ্গন শান্ত হবে কবে?

রেজোয়ান সিদ্দিকী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির এক দুঃসহ করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে। ঐ ভাষণে জনাব মিঞা ভার্সিটি সন্ত্রাসের এক ভয়াবহ ও চরম উদ্বেগজনক চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

প্রফেসর মিঞা বলেছেন, কিছু লোকের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সমাধানের যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্যাম্পাসে সংঘটিত সব বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলবদের সূতার টান আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। যারা এদের ব্যবহার করেন, তারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে আয়েশী দিন যাপন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধনকালে ভাইস চ্যান্সেলর মনিরুজ্জামান মিঞা জানান, গত এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের বলি হয়েছে ছাত্র ও বহিরাগত মিলে ছয়জন। ১৯৭৪ সালের মুহসীন হল হত্যাকান্ড বাদ দিলে আর কোন বছর ক্যাম্পাসে এত সংখ্যক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে শুধু হত্যাকান্ডের হিসাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়, এর সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনের সন্ত্রাস হিসাবে ধরা হয়নি। সে চিত্র নৈমিত্তিক, আরও ভয়াবহ, আরও মারাত্মক। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কখন কোথায় গুলির শব্দ উঠবে, কখন কে লুটিয়ে পড়বে মারণাস্ত্রের আঘাতে কেউ তা বলতে পারে না। বলতে পারে না কখন কোথায় আঘাতে কোন নিরপরাধ ছাত্রের অঙ্গহানি হবে, বারুদের গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এলাকা, পুলিশের টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝালো গন্ধে চোখ-মুখ জ্বলে যাবে সহস্র ছাত্রের কিংবা কার পায়ের রগ কখন কে কাটবে কোন নিভৃতে কিংবা প্রকাশ্য স্থানে।

এই ঘটনা প্রতি দিনের। নিরাপত্তাহীন জীবন, উদ্বেগাকুল বিদ্যাভ্যাস-এই নিয়ে চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া। এমন কি গতকালও ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে ঘটে গেল এমন কান্ড। মিছিল ছিল, জিন্দাবাদ মুর্দাবাদ ছিল, সারিবদ্ধ পুলিশ ছিল মোড়ে মোড়ে; তার মাঝখানে গুলির শব্দ, দমাদম বোমার বিস্ফোরণে বিদিশা ছাত্রছাত্রী। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা, জানালার পাশে যাদের বসবার কক্ষ, সরে গেলেন ভেতরের দিকে, সহস্রাধিক নিরীহ ছাত্রছাত্রী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ঢুকলেন লাইব্রেরীর ভেতরে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের এ কেমন চিত্র! এভাবে আর কত দিন মাত্র কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসীর দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে হাজার হাজার পাঠ-[illegible] শিক্ষার্থীকে? এ প্রশ্নের জবাব দেবার কে কোথায় আছেন?

ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মনিরুজ্জামান মিঞা এই সন্ত্রাস, নৈরাজ্য আর অনাসৃষ্টির কারণগুলো সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন। কারণগুলো হচ্ছে ঃ (১) বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সমাধানের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা, (২) হল দখলের প্রক্রিয়া এবং (৩) বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কোটি কোটি টাকার নির্মাণ কাজের চাঁদা আদায়ে অস্ত্রধারীদের আবাসিক হলে অবস্থান প্রভৃতি। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর বলেছেন, কোন কোন দল বা সংগঠনের এরূপ ধারণা হয়েছে যে, হল দখল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনে জয়লাভ করা যাবে যা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হবে। আর এইসব হল দখলের প্রক্রিয়ায় যেসব মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তার কাছে হল প্রশাসন জিম্মি। বহু চেষ্টা করেও হল প্রশাসন বহিরাগত ও অস্ত্রধারীদের হল থেকে বহিষ্কার [illegible] পারছেন না।

যেসব রাজনৈতিক দল বা সংগঠন 'নিরাপদ দূরত্বে থেকে আয়েশী জীবনযাপন করে' বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলের মাধ্যমে ডাকসুতে বিজয়ী হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছেন, তারা বোধহয় ভুলই করছেন। কারণ চর দখলের মত হল দখল করে জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা যায় না। বরং নিজেদের মত-পথ-দর্শন দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নগুলোতে অবস্থান সুদৃঢ় হয়। বাংলাদেশের ২০ বছরের ইতিহাসে তো বটেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০ বছরের ইতিহাসে সে কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যেসব রাজনৈতিক দল এখনও এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল 'বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলবদের' সুতা টানেন দূর থেকে, তাদের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। বরং এইসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন [illegible] হারানই, হারান বিপুল সাধারণ মানুষের সমর্থনও।

এই প্রক্রিয়া শুধু যে দলে দলে দলাদলি, তাই নয়, অন্তর্দলীয় কোন্দলও এর জন্য কম দায়ী নয়। গত মাসাধিককাল ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তা একটি রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফল। এতে কি তারা কেউ লাভবান হয়েছে বা হচ্ছেন? এই অন্তর্দলীয় কোন্দল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ নস্যাৎ করে দিচ্ছে, অহেতুক জিম্মি হয়ে পড়ছে ঢাকা ভার্সিটির ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী।

সেই সঙ্গে জিম্মি হয়ে পড়ছেন দেশের ২৮,০০০ অভিভাবকও। তাদের সন্তানদের জীবনের নিরাপত্তা যেমন এতে বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনি পিছিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা রেজাল্ট প্রভৃতি, পেরিয়ে যাচ্ছে চাকরিরও বয়স।

পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে সন্তানের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর যদি শুধু সেশন জটের কারণে কেউ হারায় তার কর্মসংস্থানের সুযোগ, সে দায়িত্ব কে নেবে? ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা অবশ্য অকপটে এই দায়-দায়িত্বের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট সম্পূর্ণ বহিরারোপিত হয়েছে বলে আমি মনে করি না।' সেশন জট দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য তিনি পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কিছু শিক্ষককেও দায়ী করেন। তিনি প্রশ্ন রাখেন, ছয় মাসে অনেক পরীক্ষার ফল বের হয় না, এই দোষ কি ছাত্রদের? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্ভব হয় না, সে দোষ কার? এই ক্ষেত্রে যার যা দায়িত্ব আছে, তা স্বীকার করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া অনির্ধারিত বন্ধ এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা না হওয়ার জন্য সেশন জট হয়। এই অবস্থা নিরসনে চাই আন্তরিক প্রয়াস এবং সমন্বিত কার্যক্রম।

কিন্তু প্রসঙ্গ ভিন্নতর। বলেছিলাম যুদ্ধের কথা, যুদ্ধক্ষেত্রের কথা। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থা তার পেছনে আছে অর্থেরও প্রভাব। সন্ত্রাস চাঁদাবাজ সমাজের কোথায় নেই? কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চাঁদাবাজ লালিত-পালিত হয়, তাতে কিছুটা বিস্ময় বোধ করতে হয় বৈ কি। তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর মনিরুজ্জামান মিঞা। তিনি জানান, সম্প্রতি শিক্ষকদের ৭০টি ফ্ল্যাট [illegible] জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। সেক্রেটারিয়েটসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি টেন্ডার বাক্স রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন ঠিকাদার কোম্পানী শিডিউলপত্র সংগ্রহ করলেও নির্ধারিত তারিখে কোন টেন্ডার জমা পড়েনি। খবর পাওয়া গেছে যে, দুই দল তরুণ আলাদা আলাদাভাবে ঠিকাদারদের বাসায়, অফিসের ঠিকানায় যোগাযোগ করে, মোটা অংকের টাকা দাবি করেছে। একজনকে বলা হয়েছে, পাঁচ লক্ষ টাকা না দিলে টেন্ডার ফেলতে দেওয়া হবে না। এর ফলে এক দিকে নির্মাণ কাজ ব্যাহত হয়, অন্যদিকে অর্থের ভাগাভাগি নিয়ে গোলাগুলি শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য এই পরিস্থিতির রাশ টানতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে একা এই সমস্যা সমাধান কোন দিনও সম্ভব হবে না।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। তা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে হলে যে অস্ত্র আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য যে ক্যাম্পাসে অস্ত্র আছে, অস্ত্র যায়- সেকথা সবাই জানেন। তা হলে ঐ অস্ত্র উদ্ধার করা যায় না কেন। কেন হলে পুলিশী তল্লাশীতে অস্ত্র উদ্ধার হয় না, আবার পুলিশ বেরোলেই ঝনঝনিয়ে ওঠে ঘাতক অস্ত্র? কেন হলের বেআইনী দখলদারদের উচ্ছেদ করা যায় না? কেন রোধ করা যায় না ক্যাম্পাসের ভেতরে অস্ত্রের এই আসা-যাওয়া?

দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস রোধের ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন এক আলোচনা বৈঠকে। কথা হয়েছিল, সন্ত্রাসীদের ও অস্ত্রধারীদের আশ্রয় দেবে না কোন পক্ষ, বহিষ্কার করবে নিজস্ব সংগঠন থেকে। সে কথা কি সকলে মেনেছেন? না মানলে তো স্বাভাবিকভাবেই সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, সংশ্লিষ্টরা বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে আন্তরিক নন।

এই পরিস্থিতি দৃষ্টে কখনও কখনও মনে প্রশ্ন জাগে, বিশ্ববিদ্যালয় রণাঙ্গন কি কোন দিন শান্ত হবে না? সেখানে কি কোন দিন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি হবে না? সেখানে সন্তানদের জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠিয়ে অভিভাবক কি কোন দিন নিশ্চিত হতে পারবে না? না পারলে উপায় কি? সকল অভিভাবক তো নিজের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে পড়াবার ক্ষমতা রাখেন না। তাদের উপায় কি হবে? না কি জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছবেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বন্ধ করে দেবার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই কেউ বাইরে থেকে সূতা টেনে এই সন্ত্রাসকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে?

তবু শেষ পর্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে চাই, যদি সত্যি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের মমত্ববোধ থাকে, তা হলে সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ এবং জ্ঞান সৃষ্টির একটি আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে পারি। এ জন্য সকলের সম্মিলিত প্রয়াস দরকার।